বাঙালি পুরুষ

তসলিমা নাসরিন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিনে বেশ অনেকে গৌরব করে বলেছে যে সুনীলের জীবনে বহু নারীর সমাগম ছিল, আমি বসে ভাবছিলাম, আজ কি কোনও লেখিকাকে নিয়ে এমন কথা কেউ বলতে পারবে যে তার জীবনে পুরুষ ছিল অনেক, পুরুষদের সঙ্গে প্রচুর প্রেম করেছে সে, চমৎকার সব কবিতা লিখেছে পুরুষদের নিয়ে, তার বহু-পুরুষ-গমন নিয়ে গৌরব কি করতে পারবে কেউ, যেমন গৌরব সুনীলের বেলায় করা হয়! সুনীল বা অন্য যে কোনও পুরুষের বেলায়!

বাঙালি পুরুষের সঙ্গে আমার শেষ প্রেম আজ থেকে দেড় যুগেরও বেশি আগে। নির্বাসিত জীবনে প্রেম দুএকবার এসেছে। ভিন ভাষায় প্রেমের অনুভব প্রকাশ করা যে সম্ভব হতে পারে তা আমার কল্পনারও অতীত ছিল। কিন্তু দেখলাম, সম্ভব। প্রাচ্যের এবং পশ্চিমের পুরুষের মানসিকতা একটা সময়ে গিয়ে একই রকম ঠেকে, একই রকম ম্যাগালোম্যানিয়া রোগে ভোগা, কিন্তু আচার আচরণে এক নদী তফাত। বেশির ভাগ বাঙালি পুরুষ মনে করে প্রেম করতে হলে সাতজন নারীর সঙ্গে প্রেম করতে হয়। এবং এর নাম বুঝি আধুনিকতা। (সাতজনের সঙ্গে যা করা হয় তার নাম ফষ্টি নষ্টি হতে পারে, প্রেম নয়।) একজন নারীর সঙ্গে প্রেম করে যে দীর্ঘ দীর্ঘ বছর সুখে অতিসুখে কাটিয়ে দেওয়া যেতে পারে, এ বিষয়ে তাদের ধারণা প্রায় নেই বললেই চলে। আধুনিকতা নয়, এর নাম আমি বলি প্রাচীনতা। রাজা বাদশাহ বা জমিদারদের জীবন যেরকম ছিল, উপপত্নীতে হারেম ছেয়ে থাকত, সেই প্রাচীন পুরোনো জীবনটি প্রায় সব পুরুষই যাপন করতে চায়, প্রকাশ্যে না পারলে লুকিয়ে, লুকিয়ে না পারলে মনে মনে। ভারতবর্ষের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে পুরুষদের বীভৎস রকম সুবিধে দিয়ে আসছে। এইসব সুবিধে তাদের এত বেশি আকাশে উঠিয়ে দিয়েছে যে নিচের দিকে চাইলে কীটপতঙ্গের মত, তুচ্ছ খড়কুটোর মত দেখায় নারীদের, কিছুতে আর তাদের মানুষ বলে বোধ হয় না। যে সমাজে নারী

বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, জীবনভর নির্যাতিত, যে সমাজে নারীদের যৌনসামগ্রী ছাড়া আর কিছু মনে করা হয় না, সেই সমাজ থেকে হঠাৎ গিয়ে পড়েছি পশ্চিমের আধুনিক সমাজে, যেখানে পুরুষ এবং নারীর কোনও ভেদ খালি চোখে বোঝা তো অসম্ভবই, তলিয়ে দেখলেও কোনও সুতো পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে নারী পুরুষের সমানাধিকার যে দেশগুলোয় সবচেয়ে বেশি, সেসব দেশে বাস করতে গিয়ে দেখেছি পুরুষেরা একজনের সঙ্গে প্রেম করে, তারই সঙ্গেই জীবন যাপন করে, ঘুরে ঘুরে সাত রমণীর সঙ্গে শুতে যায় না। যদি ভালোবাসা উবে যায়, তবে সম্পর্কের ইতি ঘটিয়ে দেয়। নতুন করে পরে হয়তো কাউকে ভালোবাসে। নতুন কোনও সম্পর্ক তৈরি করে, তৈরি করে যাকে সত্যিকার ভালোবাসে, তাকে নিয়ে। বিয়ের কাগজ ওসব দেশে কোনও জরুরি কাগজ নয়, যে জিনিসটি সম্পর্ক টিকিয়ে রাখে, তা কোনও কাগজ নয়, পত্র নয়, সমাজের রক্তচক্ষু নয়, তার নাম হল ভালোবাসা। নিখাদ ভালোবাসা। ভালোবাসা না থাকলে পশ্চিমে বিচ্ছেদ হয়, এ দেশে ভালোবাসা না থাকলেও বিচ্ছেদের প্রশ্ন ওঠে না। ওঠে না নারী অসহায় বলে, পরনির্ভর বলে, সন্তান লালন পালনের ভার নারীর ওপর বর্তায় বলে, সংসার সাজিয়ে রাখার জন্য নারী সুন্দর সামগ্রী বলে, ভালো পোশাক পরা সাজগোজ করা উন্নতমানের দাসী বলে।

মিথ্যের ওপর, জোড়াতালির ওপর দাম্পত্য সম্পর্ক টিকে থাকে। হৃদয়ে প্রেম নেই, অসন্তোষ আছে, ঘৃণা আছে, অথচ কেবল অভ্যেসের কারণেই বাঙালি পুরুষেরা পুরো জীবন কাটিয়ে দেয় স্ত্রীর সঙ্গে। স্ত্রীকে ভালোবাসা এবং কেবল স্ত্রীসঙ্গেই তুষ্ট থাকা, তারা মনে করে, খুব একটা গৌরবের কাজ নয়, এতে পৌরুষ উজ্জ্বল হয় না। সাধারণ মানুষ তো নয়ই, অসাধারণ মানুষও সত্যিকার শ্রদ্ধা করতে শেখেনি নারীকে, না শিখলে যা হয়, নারীর সম্মান অসম্মানের তোয়াককা কেউ করে না। শিল্পী সাহিত্যিক পুরুষদের সঙ্গে আমার বন্ধুতা শত্রুতা সবকিছু। এদের দেখেছি, আহা নারীর প্রেমে যেন জীবন দিয়ে দেবে এমন। খুঁজে পেতে দেখা যায়, একই সঙ্গে কয়েকজন নারীর জন্য তারা একই রকম হা পিত্যেশ করছে। বিশ্বস্ততা বা ফেইথফুলনেস, যেটা নারী পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পশ্চিমে, এই প্রাচ্যে এই ভারতবর্ষে এই বাংলায় সবচেয়ে অপ্রয়োজনীয়, সবচেয়ে অবান্তর, সবচেয়ে নগন্য বিষয়। তবে বিশ্বস্ত এক পক্ষকে

থাকতে হবে, সে হল স্ত্রীজাতিকে। স্ত্রীজাতি স্বামীর নাম উচ্চারণ করবে না, বারণ। স্ত্রীজাতি তাদের স্বামীদের আমার কর্তা বলে সম্বোধন করবে, নিয়ম। স্ত্রীজাতি স্বামীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি, স্বামীর ঘামেভেজা রুমালের মতো, দুর্গন্ধ অন্তর্বাসের মতো , অন্য পুরুষের ব্যবহার-অযোগ্য।

অল্প কজন বাঙালি পুরুষের সঙ্গে আমার যৌন সম্পর্ক ঘটেছে, এতেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি।

অন্য নারীর অভিজ্ঞতাও আমার অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করেছে। পশ্চিমের পুরুষেরা তাদের সঙ্গীর শীর্ষসুখের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন, সঙ্গীকে সাত আকাশে উড়িয়ে পুলকপ্রপাতে ভাসিয়ে তারপর সুখের সমুদ্রে নিজের নৌকোখানি ছেড়ে দেয়। কিন্তু বাঙালি পুরুষ তাদের সঙ্গী নিয়ে মোটেও ভাবিত নয়। সঙ্গীকে শরীরের সাঁড়াশি দিয়ে আটকে রেখে, যেন বাঘে এইমাত্র একটা নরমসরম হরিণ ধরেছে, তড়িঘড়ি নিজের খাওয়াটা খেয়ে নেয়। এভাবেই তৃপ্ত হয় নি:সাড় নারীর ওপর পুরুষের মনের কোনে লুকিয়ে থাকা ধর্ষণের স্বাদ নেওয়ার গোপন কামনা। শক্তি খাটিয়ে শরীরের তলে চেপে পিষে যেন কোনও কোলবালিশের ওপর নিজের বীর্য পতন ঘটিয়ে পাশ ফিরে পুরুষের পরমানন্দে ঘুমিয়ে পড়াকে সংসারে কার সাধ্য নিন্দা করে! যে কোনও সভ্য সমাজে কোনও স্বামী যদি স্ত্রীর ইচ্ছের বাইরে তার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে, সেই সম্পর্ককে যাহা বলা হয় তাহা সম্বন্ধে অধিকাংশ বাঙালি পুরুষ আদৌ অবগত নহেন, তাহার নাম ধর্ষণ। এবং ধর্ষণের শাস্তি স্বামী নামক ধর্ষকদের অন্য যে কোনও ধর্ষকের মতই মাথা পেতে বরণ করতে হয়। অধিকাংশ বাঙালি পুরুষ অবাধ যৌনসম্পর্কে পারদর্শী বলে নিজেদের যৌনবিশারদ মনে করে, তারা কিন্তু জানেই না নারীর যৌনাঙ্গের যাবতীয় অঞ্চল সম্পর্কে খুঁটিনাটি, কোথায় স্পর্শ করলে নারী খরদাহে পোড়ে, কোথায় করলে জলোচ্ছ্বাসে ভাসে তা কে কবে জানতে চেষ্টা করে! রমণের জন্য রমণী রক্তিম হল কি না তা বোঝার ইচ্ছেও কারও হয় না। পুরুষ বোঝে কেবল তার নিজের সুখ, নিজের আনন্দ। বাঙালি পুরুষেরা নিজেকে কদর্যভাবে ভালোবাসে, যদিও বলে, কাব্য করে, কোনও নারীকে সত্যিকার কিন্তু তারা ভালোবাসে না।

পূবের দেশগুলোয় একটা কথা খুব চালু আছে, পশ্চিমে ফ্রি সেক্স চলে। আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলছি, পশ্চিমে আমি কোনও ফ্রি সেক্স দেখিনি, ফ্রি সেক্স দেখেছি পশ্চিম বাংলায়, দেখেছি বাংলাদেশে। এখানে যৌন উত্তেজনার তীব্রতায় যে কারও ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পুরুষেরা দ্বিধা করে না। পশ্চিমে সেক্সের জন্য একটা বড় জিনিসের দরকার হয়, সে হল ভালোবাসা। অন্তত ভালো তো লাগতে হবে। আরও একটি জিনিসের দরকার হয়, তার নাম সততা। পশ্চিমে যে ব্যতিক্রম কিছু দেখা যায় না, তা নয়। সাইকোপ্যাথ সব দেশেই থাকে। কোথাও কম, কোথাও বেশি। বাঙালি কোনও সাইকোপ্যাথকে কি সত্যি সত্যি সাইকোপ্যাথ বলা হয়! হয় না। বরং অনেক সময় তাদের বুদ্ধিজীবী বলা হয়ে থাকে। আমাদের বুদ্ধিজীবীরা যা ইচ্ছে তাই করার অধিকার রাখেন বলে মনে করেন, এই হল সমস্যা। বুদ্ধিজীবীরা সাধারণত পুরুষ, তাঁরা অন্যায় করলে সে অন্যায়কে অন্যায় বলে মনে করা হয় না। সত্তর পার করেও বুদ্ধিজীবীরা সতেরো বছরের কিশোরীর বুকে থাবা বসাতে সংকোচ করেন না। ওই থাবাকে লোকে নিজগুণে ক্ষমা করে দিয়ে বলে যে, এ কবিতা বা উপন্যাস লেখার বা কোনও শিল্প গড়ার বা বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরণা আহরণ করা বৈ কিছু নয়। শিষ্যরা মাথা নেড়ে সায় দেয়। এখানে এই গুরু শিষ্যের দেশে, সাধারণের চেয়ে দুইঞ্চি ওপরে উঠেই যে কেউ গুরু বনে যেতে পারে, আর বাজারে হাত বাড়ালেই অগুনতি শিষ্য। বলো যে পৃথিবীটা চ্যাপ্টা। শিষ্যরা সমস্বরে বলবে, ঠিক ঠিক। শুনেছি পুরুষ-শিষ্যরা তাদের স্ত্রীদের প্রায়ই উপঢৌকন হিসেবে দেন, চেখে টেখে ঢেঁকুর তুলে গুরু অবশ্য যার মাল তাকে ফেরত দেন, কিন্তু আবার চাখার আবার মাখার একটি অলিখিত চুক্তি করে নিয়েই তবে দেন। ব্যাপারটি এরতরফা নয়, গুরুরা ফাঁক পেলেই শিষ্যদের নানারকম সুবিধে দান করে যারপরনাই উদারতা দেখিয়ে থাকেন।

বাঙালি পুরুষের কি নীতি বলে কিছু নেই! হ্যাঁ অনেকের নীতি আছে। অধিকাংশ নীতি প্রদর্শন করছে বাইরে, ভেতরে যদিও দূর্নীতির আখড়া। আমি প্রত্যেকের কথা বলছি না। বলছি অনেকের কথা। বলছি অধিকাংশের কথা। স্ত্রীদের তারা বাড়ির লোক বলেন। ঘরের বউ বলেন। তারা নিজেরা বাড়ির বাইরে বেরোলেও বাড়িঘর পাহারা দেওয়ার জন্য, বাড়িঘরের কাজকম্ম সারার

জন্য বাড়িতে থাকে বলে বউএর সঙ্গে সম্পর্ক ঘরের, বাড়ির। বাড়ির বাইরে যে বউকে নিয়ে তারা বেরোন না তা নয়, বেরোন, তবে ওই বেরোনো বন্ধুকে নিয়ে বেরোনোর মত নয়, অনেকটা কাঁধে পাহাড় নিয়ে বেরোনোর মতো। লক্ষ্য করেছি স্ত্রীদের পাশাপাশি হাঁটার অভ্যেস পুরুষের নেই। স্বামী আগে হাঁটবে, স্ত্রী হাঁটবে পিছনে। সপ্তপদীর হন্টন থেকেই বুঝি শুরু হয়ে যায় সুখী বিবাহের এই শর্ত। পুরুষ তার প্রেমিকা নিয়ে অবশ্য পাশাপাশি হাঁটে তবে ততদিন হাঁটে যতদিন না প্রেমিকাকে হাতের মুঠোয় পাওয়া হয়। যতদিন পাবো পাবো, ততদিন পাশাপাশি। পাওয়া হয়ে গেলেই আমি সামনে, তুমি পিছনে।

প্রেমের গুরু রবিঠাকুরই যদি প্রেমিকাকে নিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে না পারেন, তবে আর আমাদের রমেন রঞ্জনের দোষ কি! পাওয়া হোক বা হোক, রবীন্দ্রনাথ বেলায় কিন্তু অবশ্য সামনে পিছনের ব্যাপার ছিল না, যা দেখেছি যা শুনেছি সবই হল, আমি উঁচুতে, তুমি নিচুতে। আমি চেয়ারে, তুমি আমার পায়ের কাছে।

বাঙালি পুরুষের মধ্যে স্ত্রীকে পরম বন্ধু এবং প্রেমিকা ভাবার রেওয়াজ নেই। তাঁরা স্ত্রীকে কিছু স্বাধীনতা দান করে বাইরে বলে বেড়ান যে স্বাধীনতা দিয়েছেন। যেন স্বাধীনতা কাউকে দেবার জিনিস, যেন এ মানুষের জন্মগত অধিকার নয়! বাঙালি পুরুষ আলাদা নয়। সব রক্ষণশীল, সব পুরুষতান্ত্রিক সমাজে প্রায় এরকমই নিয়ম। কিন্তু বাঙালি পুরুষ শিক্ষিত হয়েও, শিল্পী হয়েও, সাহিত্যিক হয়েও, বুদ্ধিজীবী হয়েও পুরুষতন্ত্রের আরাম ভোগ করার জ ন্য পাগলপ্রায়।

বলা হয়, পশ্চিমের পুরুষের হৃদয় বলে তেমন কিছু নেই, প্রেমে বাঙালিই পড়ে, বাঙালিরই হৃদয় আছে, বাঙালিই কাঁদে। সম্পূর্ণ ভুল কথা। প্রেমের সম্পর্ক ভেঙে গেলে পশ্চিমী নারী পুরুষ উভয়কেই আমি উন্মাদের মত কাঁদতে দেখেছি। একদিন দুদিনের কান্না নয়, মাসব্যাপী কান্না। বছরব্যাপী কান্না। ছুরিতে হাত পা কাটতে দেখেছি। বিষ খেতে দেখেছি। মেট্রোর তলে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেছি। মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞর কাছে দৌড়োতে হয় ভগ্ন হৃদয়ের প্রেমিক প্রেমিকাকে। পৃথিবী ঘুরে অনেক হৃদয়বান প্রেমিক দেখেছি, বাঙালি পুরুষের মতো পাষণ্ড প্রেমিক কমই দেখেছি। বাঙালি পুরুষের মতো অপ্রেমিকও আমি কম দেখেছি।